‘মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ’ শিরোনামে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার তথ্যপঞ্জি

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

জীবনের অধিকার সবচেয়ে বড় মানবাধিকার। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মানবাধিকারের চর্চা করেছেন। মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্যই তিনি জীবনব্যাপী সংগ্রাম করেছেন; বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবিক মূল্যবোধের ধারক এবং বাহক। তিনি সকল লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে ছিলেন। কখনো কোন অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেননি। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির অধিকার সুরক্ষায় বঙ্গবন্ধু শক্ত অবস্থান নেন। তাঁর নির্দেশনায় স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে উঠে। স্বৈরাচারের ভিত নড়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাংলার মাটিকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে আপামর বাঙালি যে জনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটিই ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ে জানার জন্য প্রাসঙ্গিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের একটি ধারাবাহিক তথ্যপঞ্জি প্রয়োজন।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি:

মায়ের ভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ; পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারি; বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা; সর্বোপরি ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান মুক্তিযুদ্ধের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তবে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা বাঙালির স্বাধিকার সুরক্ষার অন্যতম স্তম্ভ ছিল। আগামী প্রজন্মকে '৬- দফা' সম্পর্কে জানতে হবে।

৬ দফা : পূর্ব বাংলার মুক্তিসনদ

১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে যোগদান করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে তিনি সংবাদ সম্মেলন করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার রক্ষার জন্যে ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। দফাগুলো হলো :

১.পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান।

২. কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি বিষয় থাকবে, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অন্যান্য সকল বিষয়ে অঙ্গারাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৩. সারাদেশে হয় অবাধে বিনিয়োগযোগ্য দু'ধরনের মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করা।

৪. সকল প্রকার কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৫. অঙ্গারাজ্যগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।

৬. অঙ্গারাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া।

- পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরম বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গভীর ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের দাবিনামায়।

ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

- পাকিস্তান সরকার ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করে। এ মামলায় রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক ও প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য বেসামরিক ব্যক্তিবর্গসহ মোট ৩৫ জনকে আসামি করা হয়; শেখ মুজিবুর রহমানকে করা হয় এক নম্বর আসামি।

- বিচারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন এ মামলার শুনানি শুরু হয়। এ মামলা প্রত্যাহারের আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ লাভ করে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

- পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পরিচালিত হয়।

- এটি বিপ্লবাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। আন্দোলনে যুক্ত হতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন।

- অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেবুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্য নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ডাকসুর ভিপি ছাত্রনেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ এ উপাধি দেন।

- ১৯৬৯ সালের গণঅভূত্থানের ফলে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং 'ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' তুলে নিতে বাধ্য হন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনা

- ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন। ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন।

- ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম 'এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে' সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে সরকার গঠন ও ৬ দফার পক্ষে গণরায় লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

- বাঙালি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা চক্রান্ত শুরু করে।

- ১৯৭১ সালের ০৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। ইয়াহিয়া খান ১-মার্চ ভুট্টোর ঘোষণাকে অজুহাত দেখিয়ে ৩ মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামত উপেক্ষিত হওয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ।

- প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল পালিত হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক এতিহাসিক ভাষণ দেন। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

- ৭ ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে পরবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিকনির্দেশনা ছিল- 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' তিনি আরোও বলেন 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা ।" এ ভাষণে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কলা-কৌশল ও শত্রু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন। এ ভাষণের পরেই বাঙালি জাতির সামনে একমাত্র গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায় 'স্বাধীনতা'

- টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলীর নীল নকশায় ২৫শে মার্চ রাতে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যা, 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু হয়। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে হত্যা করে বহু মানুষকে। পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আক্রমণ চালায় ও নৃশংসভাবে গণহত্যা ঘটায়।

- বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫ শে মার্চের রাত "কালরাত্রি" নামে পরিচিত। এ দিবসটি এখন 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত।

স্বাধীনতার ঘোষণা

- গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বুঝতে পারেন। এ ঘোষণার বাংলা অনুবাদ: "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন । আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।"

- বঙ্গবন্ধুর ডাকে আপামর বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে এই জনযুদ্ধ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

- পাকবাহিনীর ভারী অস্ত্রের শব্দে কেঁপে ওঠে বাংলাদেশ।

শরণার্থী

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক বাঙালি ভারতে গমন করেন। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪১টি শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হয়। ভারতের জনগণ বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়িয়েছিল। মে থেকে শরণার্থীর সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ভারত সরকার ওইসময় নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছিল। ভারতের লোকসভায় বাংলাদেশের শরণার্থী ও সহযোগিতা বিষয়ে রেজুলেশন গৃহীত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম

-মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে 'মুজিবনগর সরকার' গঠন করা হয়। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ ই এপ্রিল। শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর ।

স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র

- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে খুব সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।

- ১৭ এপ্রিল তারিখে বৈদ্যনাথতলায় বর্তমান মুজিবনগরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে গণপরিষদের সদস্য অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এদিনই ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দেয়া হয় এবং একইসাথে ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ১১টি সেক্টর গঠন

১১ জুলাই মুজিবনগরে উচ্চপদস্থ ও সামরিক কর্মকর্তাদের বৈঠকে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল ও যুদ্ধকৌশল সম্মন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেখানে কর্নেল মোহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী কে জেনারেল হিসাবে পদোন্নতি দেয়া হয় এবং সর্বজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসাবে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। লেঃ কর্নেল আবদুর রব সেনা প্রধান ও গ্রুপক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার উপ প্রধান নিযুক্ত হন। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের সমস্ত যুদ্ধাঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। কৃষক, শ্রমিক, নারী-পুরুষ সকলে অস্ত্র চালানোসহ বিভিন্ন বিষয়ে অবিরাম প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে। দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে মুজিব নগর সরকার সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং অবরুদ্ধ এলাকার জনগণের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আক্রমণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধ্বংস করার পর কিছু দিন আগরতলাতে এবং তারপর ২৫ মে ১৯৭১ কলকাতা থেকে নিয়মিত সম্প্রচার শুরু করা হয়। চরম পত্র, রণাঙ্গন কথিকা, রক্ত স্বাক্ষর, মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান অগ্নিশিক্ষা, দেশাত্ববোধক গান ইত্যাদি মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল।

বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড

- ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সাথে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী বাংলাদেশের অসংখ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিকদের চোখ বেঁধে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে তাদের নির্যাতনের পর হত্যা করে। চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলাদেশকে মেধা শূন্য করতে পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয়। পরবর্তীতে ঢাকার মিরপুর, রায়েরবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে গণকবরে তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

- বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার এই সশস্ত্র অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য কিছু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা, ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ 'শান্তি কমিটি', 'রাজাকার' 'আলবদর' এবং 'আলশামস' বাহিনী, পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে মুক্তিকামী মানুষের উপর জঘন্য এবং পৈশাচিক অত্যাচার ও হত্যাকান্ড চালায়। এই নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে শহীদ হয় ৩০ লক্ষ নিরীহ নিরাপরাধ শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের মানুষ। শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয় ২ লক্ষ ৫০ হাজারের অধিক বাংলার নারী।

- সমগ্র জাতিকে একত্রিত করে বিদেশী বন্ধু ও সহযোগী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় ১৬ ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

আত্মসমর্পণ ও বিজয়:

- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪.৩১ মিনিটে ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী সই করেন। আত্মসমর্পণের দলিলের নাম ছিল INSTRUMENT OF SURRENDER। প্রায় ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয় ধরা দেয় যুদ্ধ শুরুর নয় মাস পর।

- পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিল তিন প্রস্থে প্রস্তুত করা হয়েছিল। একটি প্রস্থ ভারত সরকার এবং দ্বিতীয় প্রস্থ পাকিস্তান সরকারের নিকট সংরক্ষিত আছে ও তৃতীয় প্রস্থ ঢাকার শাহবাগ জাদুঘরে আছে।

- পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, ভারতীয় ও বাংলাদেশী বাহিনীর যুগ্ম কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপসেনা প্রধান, এয়ার কমোডর এ.কে. খন্দকার আত্মসমর্পণে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে ছাড়া পান ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি ভোর রাতে । এদিন বঙ্গবন্ধুকে বিমানে তুলে দেয়া হয়। সকাল সাড়ে ৬টায় তিনি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছান । সেখানে সাক্ষাত করেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, তাজউদ্দিন আহমদ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেকের সঙ্গে।

- ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ভারতের দিল্লিতে পৌঁছানোর পর ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সমগ্র মন্ত্রিসভা, প্রধান নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধান এবং অন্যান্য অতিথি ও সেদেশের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন।

- বঙ্গবন্ধু ঢাকা এসে পৌঁছেন ১০ জানুয়ারি। লাখ লাখ মানুষ ঢাকা বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানায়। বিকাল পাঁচটায় রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ধ্রুপদী বক্তৃতায় বলেন, 'যে মাটিকে আমি এত ভালবাসি, যে মানুষকে আমি এত ভালবাসি, যে জাতিকে আমি এত ভালবাসি, আমি জানতাম না সে বাংলায় আমি যেতে পারবো কি-না। আজ আমি বাংলায় ফিরে এসেছি বাংলার ভাইয়েদের কাছে, মায়েদের কাছে, বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।'

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ণের পটভূমি

- রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ "বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ'নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হবেন। সংবিধান প্রণয়ন করাই হবে গণপরিষদের মূল লক্ষ্য।

- ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। একজন নারী সদস্য এ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হন।

- ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করা হয়। ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়।

- গণপরিষদে সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।'

- সংবিধানের প্রস্তাবনার মাঝেই ভবিষ্যতের বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষার সুস্পস্ট অঙ্গীকার রয়েছে, **প্রস্তাবনাটি নিম্নরূপ**- 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যেসকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগনকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ।

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, যাহাতে স্বাধীনসত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেই জন্য

বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরুপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তেরশত উনআশি বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক উনিশশত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম ।'

স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মূল্যবোধের চর্চা

বঙ্গবন্ধু একজন মানবিক মানুষ ছিলেন। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে মূল্যবোধের চর্চা ছিলো। তিনি অপরের কল্যানে নিজের জিনিষ বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

- নীতি: সমাজের সকলের জীবন চর্চার প্রাথমিক নিয়মাবলীই হল নীতি।

- নৈতিকতা: সমাজের সকল মানুষ যখন নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অবগত ও শ্রদ্ধাশীল হয় তখনই একটি সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে। মানুষের সামাজিক নীতির এই সার্বিক উদ্ভাস হল নৈতিকতা।

- মূল্যবোধ: নৈতিক আদর্শ পালনের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রে ঠিক-ভুল, উচিত অনুচিত সম্পর্কে যে বোধ তৈরি হয় সেটিই মূল্যবোধ।

- মূল্যবোধ হলো রীতিনীতি ও আদর্শের মাপকাঠি; যা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় । নীতি ভালো-মন্দের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে দেয়।

- সামাজিক মূল্যবোধ: যে বিষয়গুলো সমাজে সুস্থ, সুন্দর ও সম্প্রীতি তৈরী করে, সে বিষয়গুলোর চেতনাবোধই সামাজিক মূল্যবোধ।

- সর্বজন স্বীকৃত ভালো, উত্তম, সুন্দর, শালীন, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও মানবকল্যাণকর বিষয়গুলোর চর্চা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে মূল্যবোধকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

- **মানবিক মূল্যবোধের কয়েকটি উদাহরণ:** ০১. মানবতাবোধ ও মানবিকতা; ০২. দয়া-মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা; ০৩. হিতকামনা, পরোপকার, মানবকল্যাণ; ০৪. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শন; ০৫. জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান চর্চার প্রবল আকাঙ্ক্ষা; ০৬. সাহসিকতা ও বীরত্ব; ০৭. কর্মোদ্দীপনা, কর্মকৌশল, কর্মদক্ষতা; ০৮. শালীনতাবোধ ও শালীনতা চর্চা; ০৯. ন্যায় পরায়ণতা, ন্যায্যতাবোধ ও সুবিচার; ১০. সুস্থ ও সুষ্ঠু পারিবারিক বন্ধন; ১১. নীতিবোধ ও নৈতিকতার চর্চা। এসকল চর্চার মাধ্যমে মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যানে সৃষ্ট মূল্যবোধই হল মানবিক মূল্যবোধ।

- সামাজিক অবক্ষয়: সামাজিক মূল্যবোধের চর্চা না থাকলে 'সামাজিক অবক্ষয়' ঘটে।

- একটি শিশুর বেড়ে ওঠা, সুশিক্ষা লাভ, সভ্য এবং মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন হওয়ার প্রাথমিক শিক্ষালয় তার পরিবার। এ শিক্ষার শিক্ষক তার মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য। তারপর স্কুলের শিক্ষক, সমাজের সৎসঙ্গ শিশুটিকে সভ্য মানুষে পরিণত হতে ভূমিকা রাখে।

- আমাদের দেশে কোনো শিশু বা কিশোর খারাপ কথা বললে বা কাজ করলে প্রথম বাধাটি আসে তার পরিবার এবং সমাজের অভিভাবক শ্রেণী থেকে। তাদের শাসন-বারণ শিশুটিকে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন সুপথে চলতে সহায়তা করে। সময়ের সাথে সাথে শিশুর বেড়ে ওঠার মৌলিক এই প্রক্রিয়ার যেন ব্যত্যয় ঘটছে। পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ছে।

- আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, আকাশ সংস্কৃতি ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা বা তথ্য প্রযুক্তি কিশোরদের মাঝে অপরাধ প্রবণতা বাড়ার অন্যতম কারণ। তথ্য-প্রযুক্তির কারণে শিশু-কিশোরদের নৈতিক স্খলন হচ্ছে। শহরের শিশু-কিশোররা পরিবার

থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। এর ফলে তারা মাদকাসক্ত হয়ে যাচ্ছে। তারকাখ্যাতি, হিরোইজম, ক্ষমতা, বয়সের অপরিপক্কতা, অর্থলোভ, শিক্ষাব্যবস্থার ঝুঁকি এবং পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হওয়ায় তাদের সামাজিকীকরণ ও মানসিক বিকাশ দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ফলশ্রুতিতে সমাজের বিভিন্ন গ্যাং কালচারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে কিশোরেরা।

- এসব সামাজিক সমস্যা নিরসনে দরকার সর্বসম্মতিক্রমে সামাজিক আন্দোলন। এক্ষেত্রে পরিবারকে সচেতন থাকতে হবে বেশি। পরিবার মানুষের আদিসংগঠন এবং সমাজ জীবনের মূলভিত্তি। পরিবারের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে কিশোরদের গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। পাশাপাশি পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন, পাড়া মহল্লায় সামাজিক ক্লাবগঠন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাড়াতে হবে। শিশুকিশোরদের জন্য কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা এবং তাদের সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার থাকতে হবে। কিশোরদের সমাজের ইতিবাচক কাজে সম্পৃক্ত রাখতে হবে। তাই এর জন্য সমাজ ও দেশের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রাখা চাই। আগামী প্রজন্মের কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ এবং কলুষমুক্ত ও সুস্থ সমাজ গঠনে এখন থেকেই এই বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। তাহলেই ভবিষ্য নাগরিকদের অপরাধমুক্ত রাখা সম্ভবপর হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন জাগ্রত হবে প্রতিটি পরিবার থেকে, জেগে উঠবে বাংলাদেশ; বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মানবিক বাংলাদেশ।